# টিআইপি রিপোর্ট ২০০৬: মানুষ পাচার সমস্যা দুরীকরণে বাংলাদেশের অগ্রগতি অব্যাহত

**ঢাকা, ৬ই জুন, ২০০৬** -- যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিব কন্ডোলিৎসা রাইস গতকাল (৫ই জুন) মানুষ পাচার সম্পর্কে ২০০৬ সালের প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। এই প্রতিবেদনের লক্ষ্য হলো আধুনিক যুগের দাস ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সারা বিশ্বে কার্যব্যবস্থা গ্রহণকে উৎসাহিত করা এবং অংশীদারিত্ব গড়ে তোলা। পুর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনটি পাওয়া যাবে অনলাইনে। ঠিকানা : www.state.gov/g/tip ২০০৬ সালে বাংলাদেশের "টিয়ার টু" দেশের মর্যাদা অব্যাহত রয়েছে। এর অর্থ হলো বাংলাদেশ মারাত্মক ধরনের মানুষ পাচারের সমস্যা দুরীকরণে ন্যুনতম মানদন্ড পুরণ করতে না পারলেও এই সব মানদণ্ড পুরণে অগ্রগতি লাভ করছে। প্রতিবেদনে বাংলাদেশ পরিস্থিতি সম্পর্কিত অংশটির অনুবাদ নীচে দেয়া হলো:

যৌন শোষন, জোর করে ঘরবাড়িতে কাজ করানো, শিশুদের উটের জকি হিসেবে ব্যবহার এবং ঋণের দায়ে দাস হিসেবে কাজ করতে বাধ্য করার জন্য নারী, পুরুষ ও শিশু পাচারের উৎস ও ট্রানজিট দেশ বাংলাদেশ। বাংলাদেশ থেকে নারী ও শিশুদের যৌন শোষণের উদ্দেশ্যে ভারত ও পাকিস্তানে পাচার করা হয়। বাংলাদেশী মহিলারা গৃহকর্মী হিসেবে কাজ করার উদ্দেশ্যে বৈধ পথে কাতার, বাহরাইন, কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমীরাত ও সৌদী আরবসহ উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোতে যায়। কিন্তু প্রায়ই তাদের দাসত্বের পরিবেশে কাজ করতে হয়। উপরন্তু, বাংলাদেশী বালকদের উটের জকি হিসেবে কাজ করার জন্য পাচার করা হয় উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোতে। তাদের দেশের অভ্যন্তরে মৎস্য শিল্পে শ্রম দাস হিসেবে কাজ করানো হয়। বর্মী মহিলাদের ভারতে যৌন শোষণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে পাচার করা হয়।

বাংলাদেশ সরকার পাচার বন্ধের উদ্দেশ্যে ন্যুনতম মানদন্ড পুরোপুরি মেনে চলে না। যাহোক, বাংলাদেশ সরকার এই লক্ষ্যে তাৎপর্যপুর্ণ ব্যবস্থা নিয়েছে। দুই বছর আগে গৃহীত উদ্যোগগুলোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ক্রমাগত উন্নতি সাধন করে চলেছে। সরকার সংযুক্ত আরব আমীরাত থেকে ১৬৬ জন শিশুকে দেশে ফেরত নিয়ে আসে, মৎস্য শিল্প থেকে ১৬০ জন শিশু দাস শ্রমিককে মুক্ত করে, জন সচেতনতা সৃষ্টির এক ব্যাপক প্রচার শুরু করে এবং সীমান্ত রক্ষী ও

কূটনীতিকদের মানুষ পাচার প্রতিরোধের ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেয়। এই সব সাফল্য সত্ত্বেও বাংলাদেশ তাৎপর্যপূর্ণ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পাচার সমস্যার সম্মুখীন। বাংলাদেশের উচিত পাচার রোধে আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে অধিকতর অগ্রাধিকার ও সম্পদ নিয়োগ করা। সাক্ষীদের রক্ষার কার্যক্রমও বাংলাদেশের শুরু করা উচিত।

***বিচার***

বাংলাদেশ সরকার ২০০৫ সালে ৮৭টি পাচার মামলার বিচার করে , ৩৬জন পাচারকারীকে সাজা দেয়। এদের মধ্যে ২৭জনকে যাবজজীবন কারাদণ্ড দেয়া হয়। ২০০৪ সালের তুলনায় মামলার সংখ্যা ১৭টি বৃদ্ধি পেলেও সাজা দেয়ার সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। পুলিশ ১৫০ জন কথিত পাচারকারীকে গ্রেফতার করে। উল্লেখ্য যে বাংলাদেশ উটের জকি হিসেবে ব্যবহৃত শিশুদের পাচারকারীদের বিচার করতে শুরু করেছে।

সম্পদের অভাবে তদন্ত কাজ বাঁধাগ্রস্ত হলেও বাংলাদেশ পাচার প্রতিরোধের পুলিশ ইউনিট প্রতিটি জেলায় সম্প্রসারিত করেছে। এদের উদ্দেশ্যে হলো পাচারের শিকার নারী-পুরুষদের পাচারকারীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে উৎসাহিত করা এবং পাচার সম্পর্কে উপাত্ত সংকলন করা। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পুলিশ ও বিচার কর্মকর্তার অভাবের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার বিচার কর্মকর্তাদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেয়ার উদ্দেশ্যে আইন বিশেষজ্ঞদের সংগে এবং জাতীয় পুলিশ একাডেমীর জন্য একটি পাচার প্রতিরোধ বিষয়ক একটি কোর্স উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে আইওএম-এর সংগে কাজ করে। পাচারের সংগে নিরাপত্তা কর্মীদের সংশ্লিষ্টতার খবর ক্রমাগত প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও ২০০৪ সালের জুনের পর মাত্র তিনটি মামলার তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়েছেন এবং আটজন কর্মকর্তার বিরুদ্ধে পাচার কাজে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ আনা হয়েছে।

***সুরক্ষা***

আলোচ্য সময়ে বাংলাদেশ সরকার প্রদত্ত পাচারের শিকার নারী-পুরুষদের সুরক্ষার মাত্রা ছিল অপর্যাপ্ত। সীমিত সম্পদ নিয়ে সরকার পাচারের শিকারদের জন্য হাসপাতালের ক্রাইসিস সেন্টারগুলোকে সহায়তা দিয়েছে। কিন্তু সরকার পাচারের শিকার নারী-পুরুষদের আইনগত, চিকিৎসা সেবা ও মনস্তাত্ত্বিক পরিচর্যার জন্য এনজিওদের ওপর অতি মাত্রায় নির্ভরশীল ছিল। সংযুক্ত আরব আমীরাত থেকে ফেরত আনা ১৬৬ জন শিশু উটের জকির মধ্যে ১৪৪ জনকে তাদের পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দেয়া হয়েছে। ১৬ জন তাদের পরিবারের সংগে মিলিত হওয়ার জন্য

প্রস্তুতি নিচ্ছে। বাকী ছয় জনের পরিবারের সন্ধান করা হচ্ছে। বাংলাদেশের উচিত প্রতিশোধের হাত থেকে সাক্ষীদের রক্ষা এবং বিচারের সময় পাচারকারীদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিতে উৎসাহিত করতে একটি ব্যবস্থা চালু করা।

***প্রতিরোধ***

ব্যাপকভিত্তিক জন সচেতনতা সৃষ্টির কার্যক্রম এবং বিশেষায়িত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাংলাদেশ সারা বছর পাচার বিরোধী প্রচেষ্টায় তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি সাধন করেছে। টেলিভিশনে প্রচারিত ৩১৫২টি জন সচেতনতা মূলক বিজ্ঞপ্তি ও বেতারে প্রচারিত ৩০৫টি ঘোষণায় পাচারের বিপদ সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক করে দেয়া হয়। সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় ক্ষুদ্র ঋণ গ্রহীতাদের কাছে পাচার প্রতিরোধ সম্পর্কিত তথ্য পরিবেশন করেছে এবং এর মধ্য দিয়ে পাচারের ঝুঁকির মধ্যে থাকা চার লাখ মহিলার কাছে প্রয়োজনীয় তথ্য পৌঁছানো গেছে। কূটনীতিক হিসেবে কর্ম জীবন শুরু করতে যাচ্ছে এমন নবীন কূটনীতিক ও ২০ হাজারের বেশি সীমান্ত রক্ষীদের বিশেষায়িত প্রশিক্ষণ দিয়ে বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে লক্ষ্যণীয় অগ্রগতি সাধন করেছে। ২১০০ এর বেশি ইমাম পাচারের ঝুঁকি, হুমকি ও পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে এবং ১০০ জন ইমাম প্রশিক্ষক হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়েছে। এর ফলে ২০০৫ সালে ২৬৬৭ জন ইমাম জুম্মার নামাজের সময় পাচার প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রেখে লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে প্রয়োজনীয় বার্তা পৌঁছে দিয়েছে।

======

**জিআর/ ২০০৬**

***দ্রষ্টব্য:*** *এই নিবন্ধের ইংরেজি ভাষ্য 'আমেরিকান সেন্টার'-এ পাওয়া যাবে। যদি আপনি ইংরেজি ভাষ্যটি পেতে আগ্রহী হন, তবে 'আমেরিকান সেন্টার' প্রেস সেকশনে (টেলিফোন: ৮৮১৩৪৪০-৪, ফ্যাক্স: ৯৮৮৫৬৮৮; ই-মেইল:* DhakaPA@state.gov এবং *Website:* *dhaka.usembassy.gov* *এ যোগাযোগ করুন।*